www.eboosnew.blogspot.com

নবীজী

হুমায়ুন আহমেদ

www.eboosnew.blogspot.com

www.eboosnew.blogspot.com

অপ্রকাশিত রচনা

নবীজি

হুমায়ূন আহমেদ

তখন মধ্যাহ্ন।

আকাশে গনগনে সূর্য। পায়ের নিচের বালি তেতে আছে। ঘাসের তৈরি ভারী স্যান্ডেল ভেদ করে উত্তাপ পায়ে লাগছে। তাঁবুর ভেতর থেকে বের হওয়ার জন্যে সময়টা ভালো না। আউজ তাঁবু থেকে বের হয়েছে। তাকে অস্থির লাগছে। তার ডান হাতে চারটা খেজুর। সে খেজুর হাতবদল করছে। কখনো ডান হাতে কখনো বাম হাতে।

আউজ মনের অস্থিরতা কমানোর জন্যে দেবতা হাবলকে স্মরণ করল। হাবল কা'বা শরিফে রাখা এক দেবতা–যার চেহারা মানুষের মতো। একটা হাত ভেঙে গিয়েছিল বলে কা'বা ঘরের রক্ষক কোরেশরা সেই হাত সোনা দিয়ে বানিয়ে দিয়েছে। দেবতা হাবলের কথা মনে হলেই সোনার তৈরি হাত চোখে চকমক করে।

দেবতা হাবলকে স্মরণ করায় তার লাভ হলো। মনের অস্থিরতা কিছুটা কমল। সে ডাকল, শামা শামা। তাঁবুর ভেতর থেকে শামা বের হয়ে এল। শামা আউজের একমাত্র কন্যা। বয়স ছয়। তার মুখ গোলাকার। চুল তামাটে। মেয়েটি তার বাবাকে অসম্ভব পছন্দ করে। বাবা একবার তার নাম ধরে ডাকলেই সে ঝাঁপ দিয়ে এসে তার বাবার গায়ে পড়বে। শামার মা অনেক বকাঝকা করেও মেয়ের এই অভ্যাস দূর করতে পারেন নি।

www.eboosnew.blogspot.com

www.eboosnew.blogspot.com

ভূমিকা : আবদুল্লাহ্ নাসের

হুমায়ূন আহমেদ তাঁর বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিসম্ভারে সমৃদ্ধ করেছেন আমাদের শিল্প-সংস্কৃতিকে। বহুপ্রজ এই শিল্পস্রষ্টা যা কিছু সৃজন করেছেন, কোথাও এতটুকু বিচ্যুত হন নি তাঁর শেকড় থেকে, পারিপার্শ্ব থেকে। মানুষের যাপিত জীবনের দৃশ্য-অদৃশ্য নানা অঙ্গনে আলো ফেলেছেন, অনুসন্ধান করেছেন সৌন্দর্য। তারপর সাগর সেঁচে মুক্তো আহরণের মতোই তা তুলে দিয়েছেন পাঠকের পাতে, এক আশ্চর্য সরল গদ্যভাষায়। পাঠক তা গ্রহণ করেছেন, লুফে নিয়েছেন 'ওভেনফ্রেশ' পরিবেশনা হিসেবে। এভাবেই তিনি মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছেন বাঙালি পাঠককে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে।

বিচিত্র বিষয়ে অজস্র রচনা তাঁর। তিনি যা-ই লিখেছেন, যেন পাঠক অপেক্ষা করে ছিলেন সে-রচনার জন্যেই। অনেকে তাঁকে 'শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের দক্ষ রূপকার' হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর উপন্যাসে শহুরে জীবনের প্রাধান্য চোখে পড়লেও বাংলাদেশের গ্রাম-জীবনের চিত্রায়ণও উল্লেখ করার মতো। তাঁর 'অচিনপুর' কিংবা 'ফেরা' উপন্যাস দুটি এই বক্তব্য প্রমাণে যথেষ্ট। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত 'বাছাই গল্প' গ্রন্থভুক্ত পঁচিশটি গল্পের অন্তত বারোটি গ্রামভিত্তিক। এই ধারার 'শিকার' গল্পটি তাঁর এক অনবদ্য সৃষ্টি। 'খাদক', 'অচিনবৃক্ষ', 'পিশাচ', 'অয়োময়' এরকম আরও গল্পের কথা বলা যেতে পারে। গ্রামীণ পটভূমিতে অর্ধশতাব্দীর বিস্তীর্ণ ক্যানভাসে তিনি রচনা করেছেন তাঁর অন্যতম সেরা রচনা 'মধ্যাহ্ন'। তাঁর সৃষ্টিশীলতার বড় অংশ জুড়ে আছে মুক্তিযুদ্ধ। গল্প, উপন্যাস, চলচ্চিত্র সবক্ষেত্রেই এটা সত্যি। মানবিক সম্পর্কের নানাদিকে, বিশেষ করে প্রেমের শৈল্পিক প্রকাশ তাঁর শিল্পসৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। 'জোছনা ও জননীর গল্প', 'কে কথা কয়', 'লীলাবতী', 'মাতাল হাওয়া' কিংবা 'বাদশাহ নামদার'–প্রতিটি উপন্যাস বিষয় ও আঙ্গিকে স্বতন্ত্র। এই তালিকা আরও দীর্ঘ করা যেতে পারে, তবে সেটা খুব জরুরি নয়।

আমরা জানি, গল্প-উপন্যাস ছাড়াও তিনি লিখেছেন ভ্রমণোপাখ্যান, রম্যরচনা, আত্মজৈবনিক রচনা, কল্পবিজ্ঞান, ফ্যান্টাসি, শিশু-কিশোর রচনা, নাটক এবং আরও নানা কিছু। তাঁর এই বিচিত্র রচনাসম্ভারে নিঃসন্দেহে নতুন মাত্রা যোগ হতো যদি তিনি 'নবীজি' রচনাটিকে পূর্ণতা দিয়ে যেতে পারতেন।

তাঁর 'নবীজি' রচনার উদ্যোগের পেছনে একটি ছোট্ট গল্প আছে। প্রকাশনা সংস্থা অন্যপ্রকাশ যখন বাংলাবাজারে পূর্বতন বিক্রয়কেন্দ্র পরিবর্তন করে বৃহৎ পরিসরের বর্তমান বিক্রয়কেন্দ্র উদ্বোধনের জন্য হুমায়ূন আহমেদকে অনুরোধ করে, তিনি তাতে সম্মতি দেন। লেখালেখির গোড়ার দিকে প্রকাশনাসংক্রান্ত কাজে প্রায়ই বাংলাবাজারে এলেও পরে দীর্ঘদিন আর ওমুখো হন নি তিনি। অন্যপ্রকাশের নতুন বিক্রয়কেন্দ্র উদ্বোধন উপলক্ষে বহুদিন পর তিনি বাংলাবাজারে এলেন। যথাসময়ে ফিতা কেটে উদ্বোধন করা হলো বিক্রয়কেন্দ্রের। এক মাওলানা সাহেব প্রার্থনা করলেন। তারপর কী ঘটল সেটা হুমায়ূন আহমেদ নিজেই লিখেছেন দৈনিক কালের কণ্ঠে'র সাময়িকী 'শিলালিপিতে' (২১ অক্টোবর, ২০১১)।

> আমি খুবই অবাক হয়ে তাঁর প্রার্থনা শুনলাম। আমার কাছে মনে হলো, এটি বইপত্র সম্পর্কিত খুবই ভালো ও ভাবুক ধরনের প্রার্থনা। একজন মাওলানা এত সুন্দর করে প্রার্থনা করতে পারেন যে আমি একটা ধাক্কার মতো খেলাম। মাওলানা সাহেবকে

আজও নিয়মের ব্যতিক্রম হলো না। শামা এসে ঝাঁপ দিয়ে বাবার গায়ে পড়ল। সে হাঁটতে পারছে না। তার বাঁ পায়ে খেজুরের কাঁটা ফুটেছে। পা ফুলে আছে। রাতে সামান্য জ্বরও এসেছে।

শামা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাবার কাছে আসতেই তার বাবা এক হাত বাড়িয়ে তাকে ধরল। এক হাতে বিচিত্র ভঙ্গিতে শূন্যে ঝুলিয়ে তাকে কোলে তুলে নিল। শামা খিলখিল করে হাসছে। তার বাবা যেভাবে তাকে কোলে তোলেন অন্য কোনো বাবা তা পারেন না।

আউজ বলল, মা খেজুর খাও।

শামা একটা খেজুর মুখে নিল। সাধারণ খেজুর এটা না। যেমন মিষ্টি স্বাদ তেমনই গন্ধ। এই খেজুরের নাম মরিয়ম।

আউজ মেয়েকে ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। রওনা হয়েছে উত্তর দিকে। শামার খুব মজা লাগছে। কাজকর্ম না থাকলে বাবা তাকে ঘাড়ে নিয়ে

www.eboosnew.blogspot.com

www.eboosnew.blogspot.com

ডেকে বললাম, 'ভাই, আপনার প্রার্থনাটা শুনে আমার ভালো লেগেছে।' মাওলানা সাহেব বললেন, 'স্যার, আমার জীবনের একটা বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল আপনার সঙ্গে একদিন দেখা হবে। আল্লাহ আমাকে সেই সুযোগ করে দিয়েছেন। আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।' আমি তাঁর কথা শুনে বিস্মিত হলাম। আমি বললাম, 'এই আকাঙ্ক্ষাটি ছিল কেন?' মাওলানা সাহেব বললেন, 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই, কারণ আমি ঠিক করেছি, দেখা হলেই আপনাকে আমি একটা অনুরোধ করব।'

'কী অনুরোধ শুনি?'

'আপনার লেখা স্যার এত লোক আগ্রহ নিয়ে পড়ে, আপনি যদি আমাদের নবি-করিমের জীবনীটা লিখতেন, তা হলে বহু লোক লেখাটি আগ্রহ করে পাঠ করত। আপনি খুব সুন্দর করে তাঁর জীবনী লিখতে পারতেন।'

মাওলানা সাহেব কথাগুলো এত সুন্দর করে বললেন যে, আমার মাথার ভেতরে একটা ঘোর তৈরি হলো। আমি তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'ভাই, আপনার কথাটা আমার খুবই মনে লেগেছে। আমি নবী-করিমের জীবনী লিখব।'

এই হলো ফার্স্ট পার্ট। চট করে তো জীবনী লেখা যায় না। এটা একটা জটিল ব্যাপার, কাজটা বড় সেনসেটিভ। এতে কোথাও একটু উনিশ-বিশ হতে দেওয়া যাবে না। লিখতে নিয়ে কোথাও যদি আমি ভুল তথ্য দিয়ে দিই, এটি হবে খুবই বড় অপরাধ। এটা আমাকে লেখা শুরু করতে বাধা দিল।...

আমি অন্যদিন-এর মাসুমকে বললাম, 'তুমি একটা সুন্দর কাভার তৈরি করে দাও তো। কাভারটা চোখের সামনে থাকুক। তা হলে আমার শুরু করার আগ্রহটা বাড়বে।' মাসুম খুব চমৎকার একটা কাভার তৈরি করে দিল। বইটার নামও দিলাম–'নবীজি'। তখন একটা ছেলেমানুষি ঢুকে গেল মাথার মধ্যে। ছেলেমানুষিটা হলো, আমি শুনেছি বহু লোক নাকি আমাদের নবীজিকে স্বপ্নে দেখেছেন। কিন্তু আমি তো কখনো তাঁকে স্বপ্ন দেখি নি। আমি ঠিক করলাম, যেদিন নবীজিকে স্বপ্নে দেখব, তার পরদিন থেকে লেখাটা শুরু করব। স্বপ্নে এখন পর্যন্ত তাঁকে দেখি নি। যেহেতু এক ধরনের ছেলেমানুষি প্রতিজ্ঞার ভেতর আছি, সে কারণে লেখাটা শুরু করতে পারি নি। ব্যাপারটা হাস্যকর। তবু আমি স্বপ্নের অপেক্ষায় আছি।

লেখাটি হুমায়ূন আহমেদ শুরু করেছিলেন। একটি প্রারম্ভিক অধ্যায় ও একটি মূল অধ্যায়ের অনেকখানি লিখেন তিনি। তারপর আর লেখা হয়ে ওঠে নি তাঁর। নানাবিধ ব্যস্ততার সাথে সবশেষে যোগ হয় হন্তারক ব্যাধি ক্যানসারের আক্রমণ। স্বল্পায়তন এই লেখাতে তাঁর একান্ত নিজস্ব গদ্যশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। ছোট ছোট বাক্য আর গল্প বলার যে অদ্ভুত দক্ষতা ছিল তাঁর সহজাত, এখানেও সেটি দৃশ্যমান। যেটুকু তিনি লিখেছেন, তা আমাদের পাঠতৃষ্ণাকে জাগিয়ে তোলে তীব্রভাবে। কিন্তু হায়, তৃষ্ণা মিটবে কীভাবে! তিনি যে লেখাটি অসম্পূর্ণ রেখেই চলে গেলেন। ০

বেড়াতে বের হন। তবে এমন কড়া রোদে কখনো না। আউজ বলল, রোদে কষ্ট হচ্ছেরে মা?

শামা বলল, না।

তার কষ্ট হচ্ছিল। সে না বলল শুধু বাবাকে খুশি করার জন্যে।

বাবা!

হুঁ।

আমরা কোথায় যাচ্ছি?

তোমাকে অদ্ভুত একটা জিনিস দেখাব।

সেটা কী?

আগে বললে তো মজা থাকবে না।

তাও ঠিক। বাবা, অদ্ভুত জিনিসটা শুধু আমি একা দেখব? আমার মা দেখবে না?

www.eboosnew.blogspot.com

www.eboosnew.blogspot.com

বড়রা এই জিনিস দেখে মজা পায় না।

আউজ মেয়েকে ঘাড় থেকে নামাল। সে সামান্য ক্লান্ত। তার কাছে আজ শামাকে অন্যদিনের চেয়েও ভারী লাগছে। পিতা এবং কন্যা একটা গর্তের পাশে এসে দাঁড়াল। কুয়ার মতো গর্ত, তবে তত গভীর না।

আউজ বলল, অদ্ভুত জিনিসটা এই গর্তের ভেতর আছে। দেখো ভালো করে। শামা আগ্রহ এবং উত্তেজিত হয়ে দেখছে। আউজ মেয়ের পিঠে হাত রাখল। তার ইচ্ছা করছে না মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলতে। কিন্তু তাকে ফেলতে হবে। তাদের গোত্র বনি হাকসা আরবের অতি উচ্চ গোত্রের একটি। এই গোত্র মেয়েশিশু রাখে না। তাদের গোত্রের মেয়েদের অন্য গোত্রের পুরুষ বিবাহ করবে ? এত অসম্মান ?

ছোট্ট শামা বলল, বাবা, কিছু তো দেখি না।

আউজ চোখ বন্ধ করে দেবতা হাবলের কাছে মানসিক শক্তির প্রার্থনা করে শামার পিঠে ধাক্কা দিল।

মেয়েটা 'বাবা' 'বাবা' করে চিৎকার করছে। তার চিৎকারের শব্দ মাথার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। আউজকে দ্রুত কাজ সারতে হবে। গর্তে বালি ফেলতে হবে। দেরি করা যাবে না। একমুহূর্ত দেরি করা যাবে না।

শামা ছোট্ট হাত বাড়িয়ে ভীত গলায় বলছে, বাবা, ভয় পাচ্ছি। আমি ভয় পাচ্ছি।

আউজ পা দিয়ে বালির একটা স্তূপ ফেলল। শামা আতঙ্কিত গলায় ডাকল, মা! মা গো!

তখন আউজ মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, উঠে আসো।

আউজ মাথা নিচু করে তাঁবুর দিকে ফিরে চলেছে। তার মাথায় পা ঝুলিয়ে আতঙ্কিত মুখ করে ছোট্ট শামা বসে আছে। আউজ জানে সে মস্ত বড় ভুল করেছে। গোত্রের নিয়ম ভঙ্গ করেছে। তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। তাকে অবশ্যই গোত্র থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। এই অকরুণ মরুভূমিতে সে শুধুমাত্র তার স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে বাঁচতে পারবে না। জীবনসংগ্রামে টিকে থাকতে হলে তাকে গোত্রের সাহায্য নিতেই হবে। গোত্র টিকে থাকলে সে টিকবে।

বেঁচে থাকার সংগ্রামের জন্যে গোত্রকে সাহায্য করতেই হবে। গোত্র বড় করতে হবে। পুরুষশিশুরা গোত্রকে বড় করবে। একসময় যুদ্ধ করবে। মেয়েশিশুরা কিছুই করবে না। গোত্রের জন্যে অসম্মান নিয়ে আসবে। তাদের নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটে যাওয়াও কষ্টকর।

আউজ আবার গর্তের দিকে ফিরে যাচ্ছে। ছোট্ট শামা ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। মরুভূমিতে দিকচিহ্ন বলে কিছু নেই। সবই এক।

আজ থেকে সতেরো শ' বছর আগে আরব পেনিসুয়েলার এটি অতি সাধারণ একটি চিত্র। রুক্ষ কঠিন মরুভূমির অতি সাধারণ নাটকীয়তাবিহীন ঘটনা। যেখানে বেঁচে থাকাই অসম্ভব ব্যাপার সেখানে মৃত্যু অতি তুচ্ছ বিষয়।

আরব পেনিসুয়েলা। বিশাল মরুভূমি। যেন আফ্রিকার সাহারা। পশ্চিমে লোহিত সাগর, উত্তরে ভারত মহাসাগর, পূর্বে পার্শিয়ান গালফ। দক্ষিণে প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়ার নগ্ন পর্বতমালা। সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অঞ্চল। এখানে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা বলে কিছু নেই, সারা বৎসরই মরুর আবহাওয়া। দিনে প্রখর সূর্যের উত্তাপ সব জ্বালিয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। সারা দিন ধরে বইছে মরুর শুষ্ক হাওয়া। হাওয়ার সঙ্গে উড়ে আসছে তীক্ষ্ণ বালুকণা। কোথাও সবুজের চিহ্ন নেই। পানি নেই। তারপরেও দক্ষিণের পর্বতমালায় বৃষ্টির কিছু পানি কীভাবে কীভাবে চলে আসে মরুভূমিতে। হঠাৎ খানিকটা অঞ্চল সবুজ হয়ে ওঠে। বালি খুঁড়লে কাদা মেশানো পানি পাওয়া যায়। তৃষ্ণার্ত বেদুইনের দল ছুটে যায় সেখানে। তাদের উটগুলির চোখ চকচক করে ওঠে। তারা হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কাঁটাভর্তি গুল্ম চিবায়। তাদের ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে থাকে। তারা নির্বিকার। মরুর জীবন তাদের কাছেও কঠিন। অতি দ্রুত পানি শেষ হয়। কাটাভর্তি গুল্ম শেষ হয়। বেদুইনের দলকে আবারও পানির সন্ধানে বের হতে হয়। তাদের থেমে থাকার উপায় নেই। সব সময় ছুটতে হবে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। কোথায় আছে পানি ? কোথায় আছে সামান্য সবুজের রেখা ? ক্লান্ত উটের শ্রেণী তাদেরকে মরুভূমির একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে নিয়ে চলে।

মাঝেই যুদ্ধ। এক গোত্রের সঙ্গে আরেক গোত্রের হামলা। পরিচিত গোত্রের পুরুষদের হত্যা করা। রূপবতী মেয়েদের দখল নিয়ে নেওয়া। রূপবতীরা সম্পদের মতো, তাদের বেচাকেনা করা যায়।

প্রতিটি গোত্র নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টাতেই যুদ্ধ চালিয়ে যায়। ব্যবসায়ীরা মালামাল নিয়ে সিরিয়া বা ইয়ামেন থেকে যখন আসা-যাওয়া

www.eboosnew.blogspot.com

www.eboosnew.blogspot.com

করে তখন তাদের উপরও ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। মালামাল লুট করতে হয়। বেঁচে থাকতে হবে। সারভাইবেল ফর দ্য ফিটেস্ট। ভয়ঙ্কর এই মরুভূমিতে যে ফিট সে-ই টিকে থাকবে। তাদের কাছে জীবন মানে বেঁচে থাকার ক্লান্তিহীন যুদ্ধ।

এই ছোটাছুটির মধ্যেই মায়েরা গর্ভবতী হন। সন্তান প্রসব করেন। অপ্রয়োজনীয় কন্যাসন্তানদের গর্ত করে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হয়।

পবিত্র কোরান শরিফে সূরা তাকবীরে জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা বিষয়ে আয়াত নাজেল হলো। কেয়ামতের বর্ণনা দিতে দিতে পরম করুণাময় বললেন–

> সূর্য যখন তার প্রভা হারাবে, যখন নক্ষত্র খসে পড়বে, পর্বতমালা অপসারিত হবে। যখন পূর্ণ গর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে, যখন বন্যপশুরা একত্রিত হবে, যখন সমুদ্র স্ফীত হবে, দেহে যখন আত্মা পুনঃসংযোজিত হবে, তখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাস করা হবে–কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল ?

যে মহামানব করুণাময়ের এই বাণী আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন, আমি এক অকৃতী তাঁর জীবনী আপনাদের জন্যে লেখার বাসনা করেছি। সব মানুষের পিতৃঋণ-মাতৃঋণ থাকে। নবীজির কাছেও আমাদের ঋণ আছে। সেই বিপুল ঋণ শোধের অতি অক্ষম চেষ্টা।

ভুলভ্রান্তি যদি কিছু করে ফেলি তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি পরম করুণাময়ের কাছে। তিনি তো ক্ষমা করার জন্যেই আছেন। ক্ষমা প্রার্থনা করছি নবীজির কাছেও। তাঁর কাছেও আছে ক্ষমার অথৈ সাগর।

'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে।'

বিখ্যাত এই গানের কলি শুনলেই অতি আনন্দময় একটি ছবি ভেসে ওঠে। মা মুগ্ধ চোখে নবজাত শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর কোলে পূর্ণিমার স্নিগ্ধ চন্দ্র। তাঁর চোখ-মুখ আনন্দে ঝলমল করছে।

ঘটনা কি সে রকম ?

সে রকম হওয়ার কথা না। শিশুটির বাবা নেই। বাবা আবদুল্লাহ তাঁর সন্তানের মুখ দেখে যেতে পারেন নি। মা আমিনার হৃদয় সেই দুঃখেই কাতর হয়ে থাকার কথা। আরবের শুষ্ক কঠিন ভূমিতে পিতৃহীন একটি ছেলের বড় হয়ে ওঠার কঠিন সময়ের কথা মনে করে তাঁর শঙ্কিত থাকার কথা।

শিশুর জন্মলগ্নে মা আমিনার দুঃখ-কষ্ট যে মানুষটি হঠাৎ দূর করে দিলেন, তিনি ছেলের দাদাজান। আবদুল মোতালেব। তিনি ছেলেকে দু'হাতে তুলে নিলেন। ছুটে গেলেন কা'বা শরিফের দিকে। কা'বার সামনে শিশুটিকে দু'হাতে উপরে তুলে উচ্চকণ্ঠে বললেন, আমি এই নবজাত শিশুর নাম রাখলাম, মোহাম্মদ!

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। নতুন ধরনের নাম। আরবে এই নাম রাখা হয় না। একজন বলল, এই নাম কেন ? উত্তরে মোতালেব বললেন, মোহাম্মদ শব্দের অর্থ প্রশংসিত। আমি মনের যে বাসনায় নাম রেখেছি তা হলো–একদিন এই শিশু স্বর্গে ও পৃথিবীতে দুই জায়গাতেই প্রশংসিত হবে।

শিশুর জন্ম উপলক্ষে (জন্মের সপ্তম দিনে) দাদা মোতালেব বিশাল ভোজের আয়োজন করলেন। শিশুর চাচারাও আনন্দিত। এক চাচা আবু লাহাব তো আনন্দের আতিশয্যে একজন ক্রীতদাসীকে আজাদ করে দিলেন। ক্রীতদাসীর নাম সুয়াইবা। সে-ই প্রথম আবু লাহাবের কাছে শিশু মোহাম্মদের জন্মের খবর পৌঁছে দিয়েছিল। এই সুয়াইবাই এক সপ্তাহ মোহাম্মদকে তাঁর বুকের দুধ পান করিয়েছিলেন। নবীজি তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কন্যা রুকাইয়া ও কুলসুমকে বিয়ে দিয়েছিলেন আবু লাহাবের দুই পুত্রের সঙ্গে। একজনের নাম উৎবা, অন্যজনের নাম উতাইবা। দুই বোনকে একসঙ্গে না। রুকাইয়াকে প্রথমে। রুকাইয়ার মৃত্যুর পর কুলসুমকে। যদিও পরবর্তী সময়ে আবু লাহাবের নামে পবিত্র কোরানে আয়াত নাজেল হলো–

> ধ্বংস হোক সে। তার ধনসম্পদ ও উপার্জন তার কোনো কাজে আসবে না। সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে। তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে। তার গলদেশ খেজুর গাছের আঁশের দৃঢ় রজ্জু নিয়ে। (সূরা লাহাব)

শিশু মোহাম্মদের জন্ম তারিখটা কী ?

যাকেই জিজ্ঞেস করা হোক সে বলবে–৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ। বারোই রবিউল আওয়াল। দিনটা ছিল সোমবার। সারা পৃথিবী জুড়ে এই দিনটিই জন্মদিন হিসেবে পালন করা হয়। ঈদে মিলাদুন্নবীতে বাংলাদেশে সরকারি ছুটি পালন করা হয়।

নবীজির জন্মের সঠিক তারিখ নিয়ে কিন্তু ভালো জটিলতা আছে। ইতিহাসবিদরা মোটামুটি সবাই একমত যে তাঁর জন্ম হয়েছে হস্তিবর্ষে

www.eboosnew.blogspot.com

www.eboosnew.blogspot.com

(Year of the Elephant, 570)। নবীজির আদি জীবনীকারদের একজন ইবনে আব্বাস বলছেন, তাঁর জন্ম হস্তি দিবসে (Day of the Elephant)। একদল ইতিহাসবিদ বলছেন মোটেই এরকম না। নবীজি জন্মেছেন এর পনেরো বছর আগে। আবার একদল বলেন, নবীজির জন্ম হস্তি বছরের অনেক পরে, প্রায় সত্তুর বছর পরে।

জন্ম মাস নিয়েও সমস্যা। বেশির ভাগ ইতিহাসবিদ বলছেন চন্দ্রবৎসরের তৃতীয় মাসে তাঁর জন্ম। তারপরেও একদল বলছেন, তাঁর জন্ম মোহররম মাসে। আরেকদল বলছেন, মোটেই না। তাঁর জন্ম সাফার মাসে।

জন্ম তারিখ নিয়েও সমস্যা। একদল বলছেন রবিউল আউয়ালের ৩ তারিখ, একদল বলছেন ৯ তারিখ, আবার আরেক দল ১২ তারিখ।

এখন বেশির ভাগ মানুষই নবীজির আদি জীবনীকারের বক্তব্যকে সমর্থন করছেন। ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার জন্ম তারিখ ধরা হচ্ছে। তারপরও কথা থেকে যাচ্ছে–বারই রবিউল আউয়াল কিন্তু সোমবার না। এই হিসাব আধুনিক পঞ্জিকার।

বিতর্ক বিতর্কের মতো থাকুক। একজন মহাপুরুষ জন্মেছেন, যাঁর পেছনে একদিন পৃথিবীর বিরাট এক জনগোষ্ঠি দাঁড়াবে–এটাই মূল কথা।

তখনকার আরবে অভিজাত মহিলারা নিজের শিশু পালন করতেন না। শিশুদের জন্যে দুধমা ঠিক করা হতো। দুধমা'রা আসতেন মক্কার বাইরের বেদুইনের ভেতর থেকে।

দুধমা'র প্রচলনের পেছনে প্রধান যুক্তি, আভিজাত্য রক্ষা। দ্বিতীয় যুক্তি, শিশুরা বড় হতো মরুভূমির খোলা প্রান্তরে হেসে-খেলে। এতে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকত। অর্থনৈতিক বিষয়ও মনে হয় ছিল। সম্পদের বণ্টন হতো। হতদরিদ্র কিছু বেদুইন পরিবার উপকৃত হতো শহরের ধনীশ্রেণীর কাছ থেকে। অতি ভাগ্যবানদের কেউ কেউ মরুভূমির সবচেয়ে দামি উপহার এক-দুইটা উট পেয়ে যেত।

নবীজির জন্যে দুধমা খোঁজা হতে লাগল। মা আমিনার অর্থনৈতিক অবস্থা তখন শোচনীয়। সম্পদের মধ্যে আছে মাত্র পাঁচটা উট এবং একজন মাত্র ক্রীতদাসী। ক্রীতদাসীর নাম 'বাহিরা'। অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু পরিবারের এতিম ছেলের জন্যে কে আসবে দুধমা হিসেবে!

নবীজির প্রথম দুধমা'র নাম আইমান। তিনি আবিসিনিয়ার এক খ্রিষ্টান তরুণী। অনেক পরে এই মহিলার বিয়ে হয় যায়েদ বিন হারিসের সঙ্গে। যায়েদ বিন হারিস নবীজির পালকপুত্র।

আইমানের পরে আসেন থুআইবা। তৃতীয়জন হালিমা। যিনি বানু সাদ গোত্রের রমণী। নবীজির দুধমা হিসেবে আমরা হালিমাকেই জানি। আগের দু'জনের বিষয়ে তেমন কিছু জানি না।

হালিমার অবস্থাটা দেখি। বানু সাদ গোত্রের সবচেয়ে দরিদ্র মহিলা। ঘরে তার নিজের খাওয়ার ব্যবস্থাই নেই। বুকে দুধ নেই যে নিজের শিশুটিকে দুধ খাওয়াবেন। মক্কায় অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তিনি দত্তক নেওয়ার মতো কোনো শিশু পেলেন না। কে এমন দরিদ্র মহিলার কাছে আদরের সন্তান তুলে দেবে! প্রায় অপারগ হয়েই তিনি শিশু মোহাম্মদকে নিলেন।

পরের ঘটনা নবীজির জীবনীকার ইবনে ইসহাকের ভাষ্যে শুনি–'যেই মুহূর্তে আমি এই শিশুটিকে বুকে ধরলাম, আমার স্তন হঠাৎ করেই দুধে পূর্ণ হয়ে গেল। সে তৃপ্তি নিয়ে দুধ পান করল। তার দুধভাইও তা-ই করল। দুজনই শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল। আমার স্বামী উঠে গেল মেয়ে উটটাকে দেখতে। কী আশ্চর্য, তার শুকনো ওলানও দুধে পূর্ণ। আমার স্বামী দুধ দুয়ে আনলো। আমরা দুজন প্রাণভরে সেই দুধ খেয়ে পরম শান্তিতে রাত্রে ঘুমালাম। পরদিন সকালে আমার স্বামী বলল, হালিমা, তুমি কি বুঝতে পারছ তুমি এক পবিত্র শিশুকে (Blessed one) ঘরে এনেছ ?'

শিশু মোহাম্মদের দুধভাইয়ের নাম আবদুল্লাহ। আবদুল্লাহর তিন বোন–শায়মা, আতিয়া ও হুযাফা। বোন শায়মা সবার বড়। শিশু মোহাম্মদকে তার বড়ই পছন্দ। সারা দিনই সে চন্দ্রশিশু কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এখানে-ওখানে চলে যায়। একদিন বিবি হালিমা মেয়ের উপর খুব বিরক্ত হলেন। মেয়েকে ধমক দিয়ে বললেন, দুধের শিশু কোলে নিয়ে তুমি প্রচণ্ড রোদে রোদে ঘুরে বেড়াও। এটা কেমন কথা! বাচ্চাটার কষ্ট হয় না!

শায়মা তখন একটা অদ্ভুত কথা বলল। সে বলল, মা, আমার এই ভাইটার রোদে মোটেও কষ্ট হয় না। যখনই আমি তাকে নিয়ে ঘুরতে বের হই, তখনই দেখি আমাদের মাথার উপর মেঘ। মেঘ সূর্যকে ঢেকে রাখে।

নবীজিকে মেঘের ছায়া দান বিষয়টি জীবনীকার অনেকবার এনেছেন। তাঁর চাচা আবু তালেবের সঙ্গে প্রথম সিরিয়ায় বাণিজ্য যাত্রাতেও মেঘ তাঁর মাথায় ছায়া দিয়ে রেখেছিল। ০

www.eboosnew.blogspot.com